# কয়লাখনি বন্ধের পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের নির্দেশে ভারতীয় জনগণের উপর এক বিরাট আক্রমণ

( একটি প্রতিবেদন )

ই.সি এল কলিয়ারী শ্রমিক ইউনিয়ন

জানুয়ারী, ১৯৯৯

প্রকাশক : সন্তোষ রাণা
৮ বি, শ্যাম প্লেস
কলকাতা-৭০০০১৯

মুদ্রক : সত্য প্রেস
১০/২এ, প্যারীমোহন শূর লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

দাম—২ টাকা।

আই সি আই সি আই ( I C I C I ) এর এক সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের কয়লামন্ত্রক এবং ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড ( ই সি এল ) কর্তৃপক্ষ ৬৪টি কয়লাখনি বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই খনিগুলি সাতগ্রাম, সোদপুর, শ্রীপুর, সালানপুর, পান্ডবেশ্বর এবং মুগমা ( বিহার )—এই ছয়টি এরিয়ার মধ্যে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার ও ই সি এল কর্তৃপক্ষের এই পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে পড়ার পর সমগ্র কয়লাখনি এলাকায় শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য জনগণের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। এই অবস্থায় পঃ বঃ সরকারও কয়লাখনি বন্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করেন এবং কয়লাখনি থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সেস আদায় করতেন তার পরিমান কমিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেন। এরপর কেন্দ্রীয় সরকারের কয়লামন্ত্রী এবং পঃ বঃ রাজ্য সরকারের মধ্যে আলোচনার পর খনি বন্ধের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য এক কমিটি গঠিত হয় এবং আপাততঃ কয়লাখনি বন্ধ হবে না বলে ঘোষণা হয়। কিন্তু বাস্তবত, এই ঘোষনার পরেও খনি বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যেমন গত মাসখানেকের মধ্যে ই সি এলের পাঁচ হাজার কর্মীকে স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্পে সই করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই আরো দশ হাজারকে সই করতে বাধ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া যে কয়লাখনিগুলি বন্ধ করে দেওয়ার কথা, সেগুলি থেকে যন্ত্রপাতি সরিয়ে নেওয়ার কাজ

চলছে এবং এগুলির মোট সম্পদ ( asset ) মূল্যায়নের কাজও করা হচ্ছে। এসব থেকে মনে হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার কয়লাখনিগুলি বন্ধ করে দিতে বদ্ধপরিকর।

এই খনিগুলি যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার ফলাফল হবে এই এলাকার ক্ষেত্রে বিপর্যয়কর। ৬৪টি খনির ৭২ হাজার শ্রমিক কাজ হারাবেন। এর অর্থ, তাঁদের পরিবার হিসেব করলে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ তাঁদের জীবন জীবিকা হারাবেন। শুধু এই নয়, এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জীবন যাপনের সামগ্রী সরবরাহ ও অন্যান্য পরিষেবার জন্য ছোট ছোট স্থানীয় বাজার সহ রানীগঞ্জ, আসানসোল, বরাকর, কুলটি, জামুরিয়া, হরিপুর, উখড়া, অণ্ডাল ও পাণ্ডবেশ্বের প্রভৃতি যে বাজারগুলি দীর্ঘদিন ধরে কয়লাশিল্পের অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে, তা প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাবে। ফলে এই বিশাল অঞ্চলের ছোট মাঝারী বড় ব্যবসাদার থেকে শুরু করে কুলি, মজুর, রিক্সাওয়ালা, মালবাহী গাড়ী, গাড়ির চালক, গ্যারেজ কর্মী, হকার, বাস-মিনিবাস-ট্যাক্সি, ট্রেকার প্রভৃতির পরিবহন কর্মী ইত্যাদি নানা স্তরের মানুষের জীবিকা ও আয়ের উৎস শেষ হয়ে যাবে। এর সঙ্গে খনির ঠিকাদার, ঠিকাদার শ্রমিক, বালির ট্রাকের কর্মী ইত্যাদি লোকেরাও কাজ ও জীবিকা হারাবে। এই সব নিয়ে আরো প্রায় দশ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকার উপর নেমে আসবে বিরাট আঘাত।

কয়লাখনি শুরু হওয়ার আগে এই বিস্তীর্ণ এলাকা কৃষি এলাকা ছিল। গ্রামগুলি ছিল কৃষি অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে। খনি চালু হওয়ার পর এবং বিশেষ করে ওপেন কাস্ট (Ocp) ও লংওয়াল পদ্ধতি

চালু হওয়ার পর এই এলাকার কৃষি একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। বর্ধমান জেলার আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমার এই এলাকায় এখনো কিছু চাষ হয় কিন্তু তাতে এখানে বসবাসকারী মানুষের দশ শতাংশেরও কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভব নয়।

যে আর্থিক সংস্থা খনিগুলি বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশ করেছেন তারা এই ৯০ শতাংশ মানুষের অর্থাৎ প্রায় ১৫/২০ লক্ষ মানুষের কি হবে সে প্রশ্ন উত্থাপনও করেন নি। কারণ এটা তাদের কাজ নয়। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ যে সংকটের মধ্যে পড়েছে সেই সংকট থেকে বাঁচানোর জন্য কয়েক লক্ষ মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতেও তাদের কোন দ্বিধা নেই।

আই সি আই সি আই তাদের রিপোর্ট তৈরি করার সময় ই সি এল সদর দপ্তরের দেওয়া বার্ষিক আয়-ব্যয়, লাভ-ক্ষতি ও উৎপাদনের তারতম্য ইত্যাদি তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে খনিগুলিকে চারটি গ্রুপে ভাগ করেছে। চার নম্বর গ্রুপের ৬৪টি খনি তারা বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। খনি বিজ্ঞান ও খনি-পরিচালনা সম্পর্কে কোন জ্ঞান এই অর্থ লগ্নীকারী সংস্থাটির নেই। ৫০-এর দশক থেকে শক্তি-উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত সরকার যে দেশের স্বয়ম্ভরতার নীতির উপর না দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রয়োজন দ্বারা পরিচালিত হয়েছে সে প্রশ্নও এই সংস্থাটি উত্থাপন করে নি কিংবা এখনই কিভাবে এই খনিগুলিকে চালু রেখে উৎপাদন বাড়ানো যায় সেটাও তারা ভেবে দেখেনি।

সম্প্রতি ই সি এল কলিয়ারি শ্রমিক ইউনিয়ন তাদের এক প্রতিবেদনে

খনিগুলিতে লোকসান হওয়ার পেছনে নিম্নলিখিত মোটা দাগের কারণগুলি চিহ্নিত করেছেন :

(১) ভুল পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমি দেশগুলি থেকে অত্যন্ত পুঁজি-নিবিড় ব্যয়সাধ্য প্রযুক্তির আমদানি। এই প্রযুক্তি রাণীগঞ্জে কয়লা স্তরের অবস্থান ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ না হওয়ায় এগুলি প্রায় সবই ব্যর্থ হয়েছে। যেমন লংওয়াল প্রযুক্তির কথা ধরা যেতে পারে। এই প্রযুক্তির জন্য তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ করা হয়েছে। কিন্তু ৫টি লংওয়ালের মধ্যে ৪ টিই অর্থাৎ শীতলপুর, ধেমোমেন, চীনকুড়ি ও থোট্রাডি সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং ঝাঁঝরা চালু থাকলেও ক্ষতিতে চলছে। ভারত সরকার বিদেশী ঋণ নেবার সময় ঋণ দাতারা তাদের যেকোন প্রযুক্তি ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, সেই প্রযুক্তি ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ভারতীয় অবস্থায় কার্যকর হোক বা না হোক।

(২) ভারত সরকার নতুন যা বিনিয়োগ করেছে তা সবই ওপেন কাস্ট বা লংওয়াল প্রযুক্তিতে। পুরানো আন্ডার গ্রাউন্ড খনিগুলি (যার সংখ্যা ৮০) তে বিনিয়োগ সাংঘাতিক ভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে বহু ক্ষেত্রে ছোটখাটো কিছু যন্ত্রপাতির অভাবেও উৎপাদন মার খাচ্ছে। কোম্পানি আমলের ফেলে যাওয়া যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করার ফলে উৎপাদন কমছে।

(৩) নির্ধারিত উৎপাদনের লক্ষ্যে সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার জন্য দায়বদ্ধ হিসেবে কাজ করার বদলে জাতীয়করণের পর থেকে সি এম ডি, ডাইরেক্টার, জি এম স্তরের বড় অফিসারেরা বড় ঠিকাদারদের

কাজ পাইয়ে দিয়ে এবং নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ও মাল সরবরাহের সুযোগ করে দিয়ে, কয়লা চুরি করে এবং বড় বড় স্টোরগুলি থেকে দামি দামি যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলে বেআইনী ভাবে কোটি কোটি টাকা রোজগার করতেই ব্যস্ত থেকেছে। ই সি এলের অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত বড় অফিসারদের আহরিত সম্পত্তি নিয়ে তদন্ত করলেই এই চুরির মাত্রা ধরা পড়বে।

(৪) গোটা ই সি এল এ প্রায় দু হাজার রাজনৈতিক দাদা, মাফিয়া ঠিকাদার ও মাস্তান আছে যারা নামেই ই সি এলের কর্মচারী; কোন কিছু না করে মাসে মাসে পুরো বেতন নিয়ে যায়। তাদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দিতেই বছরে প্রায় ২০ কোটি টাকা খরচ হয়। কর্তৃপক্ষ এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না কারণ কর্তৃপক্ষ নিজেরা যে অনেক বেশি চুরি করে তাতে এদের সহযোগিতা আছে।

(৫) ই সি এলের স্টকে প্রায় ৫০ লক্ষ টন কয়লা জমে আছে, অথচ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড থেকে কয়লা আমদানি করা হচ্ছে। কয়লা আমদানির স্বার্থে আমদানি করা কয়লার উপর আমদানি শুল্ক তুলে দেওয়া হয়েছে

প্রকৃত পক্ষে, কয়লা শিল্পে আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার সামগ্রিক সংকটের চেহারাটা বেরিয়ে আসে। এই সংকটের মূল কারণ সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদী বিকাশের রাস্তা গ্রহণ।

১৯৯১ সালে ভারত সরকার যখন বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ-

ভাণ্ডারের কাছ থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে খুলে দেওয়ার শর্তে যখন ঋণ নেয়, তখন ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় এমন জায়গায় নেমে গেছিল যা দিয়ে আর মাত্র পনেরো দিনের আমদানি খরচ মেটানো সম্ভব ছিল। এটা জানা কথা যে ভারতের এই বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের পেছনে আশু কারণ ছিল পেট্রলিয়াম এবং পেট্রলিয়াম-জাত দ্রব্যের মূল্য এবং চাহিদা বৃদ্ধি। বর্তমানে ভারতে ব্যবহৃত মোট বাণিজ্যিক শক্তি-সম্পদের বড় অংশীদার হল খনিজ তেল (৫৫ শতাংশ), তারপর কয়লা (৩৫ শতাংশ) এবং বিদ্যুৎ (১০ শতাংশ)। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে আমাদের দেশের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও চাহিদার বৃদ্ধি হয়েছে ১১ গুণ, খনিজ তেল প্রায় ৬ গুণ কিন্তু কয়লা মাত্র ২ গুণ। বাণিজ্যিক শক্তি-সম্পদের প্রধান উৎস হিসাবে পেট্রল ব্যবহার করার জন্য আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের খুব বড় অংশ পেট্রল আমদানি করতেই খরচ হয়ে যায়। বর্তমানে ভারতের সমগ্র আমদানি ব্যয়ের এক চতুর্থাংশের বেশি খনিজ তেল আমদানির জন্য খরচ হয়। আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান না করতে পারার জন্য (এবং কতকগুলো অন্য মৌলিক কারণে) বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ে এবং বর্তমানে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ৪০ শতাংশই খরচ হয়ে যায় বিদেশী ঋণের দায় মেটাতে। দিনকে দিন এই পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে এবং আমরাও মেক্সিকোর ন্যায় ঋণ ফাঁদের দিকে এগোচ্ছি। অবস্থা এতদূর সঙ্গীন হয়েছে যে ভারত সরকার এখন বীমাক্ষেত্রকেও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির কাছে উন্মুক্ত করে দিতে উদ্যত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে আমাদের আমদানি করা খনিজ তেলের এক বড় অংশ সার ও অন্যান্য রাসায়নিক কারখানায় এবং রেলের

ডিজেল ইঞ্জিন চালানোর কাজে ব্যবহার হয়। রাসায়নিক কারখানা যেমন পেট্রলিয়ামের উপর ভিত্তি করে চালানো যায় তেমনি কয়লার উপর ভিত্তি করেও চালানো যায়। প্রকৃতপক্ষে খোদ ইংলণ্ডেই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে পর্যন্ত সার ও রাসায়নিক কারখানা কয়লার উপর ভিত্তি করেই চলত। আমাদের দেশেও ৫০ এর দশকে সিন্ধি সহ বিভিন্ন স্থানে কয়লা ভিত্তিক সার-কারখানা গড়ে তোলা হয়েছিল, কিন্তু '৬০ এর দশক থেকে এগুলি পরিত্যক্ত হতে থাকে এবং পেট্রলিয়ামকেই মূলে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তেমনি রেল ও কয়লার ইঞ্জিনে চালানো যায়। কিন্তু '৬০ এর দশকের শেষ থেকে কয়লার ইঞ্জিনের জায়গায় ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার শুরু হয়। রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। আমরা বর্তমানে কয়েক হাজার কোটি টাকার রান্নার গ্যাস আমদানি করি। কিন্তু রান্না তো কয়লার গ্যাস দিয়েও করা যায়। কলকাতার বহু পুরনো বাড়িতে এখনো পর্যন্ত রান্নার গ্যাসের পাইপ দেখা যায়।

আমাদের দেশের মজুত কয়লার যে ভাণ্ডার আছে, তাতে বর্তমানে আমরা যে হারে কয়লা তুলি সেই হারে আরো প্রায় এক হাজার বছর চলতে পারে। কয়লা তোলার হার দ্বিগুন করে দিলেও বা চারগুন করে দিলেও আমাদের আরো প্রায় ২০০/২৫০ বছর হেসেখেলে চলে যাবে। অথচ সারা দুনিয়ার খনিজ তেলের সম্পদ এখন প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। খুব বেশি হলে আর প্রায় ৩০/৪০ বছর।

প্রশ্ন হল, আমাদের নিজস্ব খনিজ তেলের অপ্রতুল ভাণ্ডার না থাকা সত্ত্বেও এবং প্রচুর কয়লা থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রধান বাণিজ্যিক শক্তি-

উৎস হিসাবে কয়লা ব্যবহার না করে খনিজ তেলের উপর নির্ভর করলাম কেন ? এটা করতে গিয়ে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের উপর অসহনীয় বোঝা চাপাতে গেলাম কেন এবং আমাদের উৎপাদনকে রপ্তানিমুখী করতে গিয়ে দেশের মানুষের মুখের খাবার কেড়ে নিচ্ছি কেন ?

এর উত্তর শুধু ভারতের মধ্যে খুঁজলে হবে না, তাকাতে হবে বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দিকে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ( ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি ) মূল শক্তি উৎস হিসাবে পেট্রলিয়ামের ব্যবহার শুরু করে। এর পেছনে কিছু প্রযুক্তিগত কারণ থাকলেও মূল কারণ হল সস্তায় ( প্রায় বিনা-মূল্যে ) মধ্য প্রাচ্যের তেল লুটের সুযোগ। মরুভূমিতে তেল আবিষ্কারের পরই তার উপর সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের নজর এবং তেলের জন্যই তারা সেখানে এতগুলো যুদ্ধ লড়েছে এবং এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশগুলি তেল সম্পদকে ব্যবহার করে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে পারত, সেই সুসভ্য জাতিগুলি অর্থাৎ ইরাক, ইরাণ বা মিশর থেকে তেলের এলাকাগুলিকে আলাদা করে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্যাধীনে রাখার জন্যই তারা মরুভূমির রাজাদের সৃষ্টি করে এবং ফুটি কাটার মত করে তাকে কেটে দেয়। যে মরুভূমি সর্দাররা হঠাৎ "রাজা" হয়ে বসে ( যেমন সৌদি আরব, কুয়ায়েত, কাতার, আমিরশাহী ইত্যাদির রাজারা ) তারা আসলে ছিল ভ্রাম্যমান বেদুইন সর্দার। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের মাধ্যমেই আরব দুনিয়ার অঙ্গচ্ছেদ করে এদের ক্ষমতায় বসায়। তেলের সুবাদে হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা এই সর্দাররা তেলের পয়সা কাজে লাগিয়ে কিভাবে বিনিয়োগ করা যায় বা

স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা যায় তা জানত না। তেল বিক্রির টাকাও এরা ইউরোপ আমেরিকার ব্যাংকেই জমা রাখে এবং সুদের টাকায় ফুর্তি করে। সুতরাং তেলের ব্যবহার উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছে দুদিক থেকে লাভজনক।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ঠিক পরে, যখন উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো কয়লা ভিত্তিক প্রযুক্তি থেকে তেল ভিত্তিক প্রযুক্তিতে সরে যাচ্ছে, তখন তারা তাদের দ্বারা পরিত্যক্ত কয়লা-ভিত্তিক প্রযুক্তি তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে রপ্তানি করে। ঐ সময়ে ভারতে সিন্ধ্রি সার কারখানা ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য শিল্প গড়ে ওঠে। কয়লার ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণার জন্য প্রোজেক্টস এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড (PDIL) নামক সংস্থা গড়ে তোলা হয়।

কিন্তু তেল-ভিত্তিক প্রযুক্তিরও অবিরাম বিকাশ ঘটতে থাকে। ষাটের দশকে এসে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছে ইতিমধ্যে সেকেলে হয়ে যাওয়া তেল-ভিত্তিক প্রযুক্তি রপ্তানির প্রয়োজন পড়ে। ভারত যেহেতু পুঁজি ও প্রযুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল, সুতরাং সে তেল-ভিত্তিক প্রযুক্তিতে সরে যেতে বাধ্য হল। কয়লা ইঞ্জিনের জায়গায় ডিজেল ইঞ্জিন, সার ইত্যাদির জন্য পেট্রোকেমিক্যাল এবং এমন কি রান্নার জ্বালানি হিসাবেও আমদানী করা তেল ব্যবহৃত হতে লাগল। ফলত কয়লা উত্তোলনের পদ্ধতি ও কয়লা ব্যবহারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সমস্ত গবেষণা পরিত্যক্ত হল। দক্ষিণ আফ্রিকা কয়লা থেকে পেট্রোল তৈরি করার পদ্ধতির ( SASOL কারখানা ) বিকাশ ঘটিয়েছে কিন্তু ভারতে সেরকম কোনো চেষ্টাই হয়নি। এমন

কি, PDIL এর বৈজ্ঞানিকেরা কয়লা থেকে সার ও অন্যান্য রাসায়নিক-তৈরির যে সব পদ্ধতি বিকশিত করেছিলেন, ভারত সরকার সেগুলিকে বর্জন করে তেল-ভিত্তিক শিল্পায়নের রাস্তায় চলে যায় এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের পাতা ফাঁদের মধ্যে পড়ে। এতে দেশের সর্বনাশ তো হয়-ই, আর খুব বড় রকম সর্বনাশ হয় পূর্বাঞ্চলের।

কয়লা ইঞ্জিন থেকে ডিজেল ইঞ্জিনে সরে যাওয়ার সময় এই যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে এতে রেলের গতি বাড়বে। বাস্তবে কিন্তু তা হয়নি। যতদিন রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ না হচ্ছে, ততদিন কয়লার ইঞ্জিন ব্যবহার করাই ভারতের স্বনির্ভরতার দিক থেকে লাভজনক হত। কয়লার ইঞ্জিনেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটানো সম্ভব ছিল এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ ও দক্ষ কারিগরের অভাব ভারতে ছিল না। তেমনি সার ও অন্যান্য বহু রাসায়নিক কারখানায় কয়লা ব্যবহার করা সম্ভব ছিল এবং সেই রাস্তাই নেওয়া উচিত ছিল। রান্নার জন্যও কয়লা-গ্যাস ও অন্যান্য ভাবে কয়লা ব্যবহার সম্ভব ছিল। এসব কিছু করলে ভারতের খনিজ তেল আমদানির খরচ অনেক কমে যেত এবং দেশকে রপ্তানি-ভিত্তিক উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হতো না।

কিন্তু ভারত সরকার ঠিক বিপরীতটাই করলেন। ফলে কোম্পানীর কাছ থেকে অধিগৃহীত করা কয়লা খনিগুলোর উন্নতির জন্য কোন অর্থ বিনিয়োগ হল না। সেগুলো ঝড়ঝড়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে ধুঁকতে লাগল। অপর দিকে বিরাট পরিমাণ বিদেশী ঋণ নিয়ে ভারতে প্রযোজ্য নয় এমন প্রযুক্তি আনা হ'ল। ই সি এল কলিয়ারী শ্রমিক ইউনিয়নের

রিপোর্টে দেখানো হয়েছে কিভাবে ৫টির মধ্যে ৪টি লংওয়াল প্রোজেক্ট ব্যর্থ হয়েছে।

আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষ জানেন যে আজ কয়লা শিল্প যেমন সংকটের মধ্যে পড়েছে, তেমনি ঐ এলাকার আরো কয়েকটি বড় শিল্পও মৃত্যুর দিন গুণছে। তেমন এক বড় শিল্প হল মাইনিং এন্ড এ্যালায়েড মেসিনারী কর্পোরেশন ( MAMC )। এই কর্পোরেশন গড়ে তোলা হয়েছিল মূলত কয়লাখনির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু খনিতে যেটুকু নতুন বিনিযোগ হল তার সবটাই বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তি ভিত্তিক। তারা এম এ এম সি কে অর্ডার দেবে কেন? এম এ এম সি রুগ্ন হয়ে পড়ার এটাই মূল কারণ যদিও অন্য কিছু কারণও আছে। এখন, কেন্দ্রীয় সরকার যে আটটি সরকারী মালিকানার সংস্থার গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে এম এ এম সি-ও রয়েছে।

সুতরাং, আমরা কয়লাখনি বন্ধের পেছনের কাহিনী খুঁজতে গিয়ে "স্বাধীন" ভারতের গোটা অর্থ ব্যবস্থার একটা চিত্র পাচ্ছি—সে চিত্র হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভর করে পুঁজিবাদী রাস্তা গ্রহণ করার চিত্র এবং ফলতঃ দেশকে দেউলিয়া অবস্থায় নিয়ে গিয়ে তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়ার চিত্র।

প্রশ্ন হল, ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? বা অন্য ভাবেও প্রশ্নটা তোলা যায়ঃ ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এই রকম রাস্তা নিল কেন? এর উত্তর, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মৌলিক চরিত্রের মধ্যে নিহিত। যে কোন দেশে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে গেলে তিনটি মৌলিক উপাদান প্রয়োজন। সেগুলি হলঃ পুঁজি, প্রযুক্তি ও বাজার। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর কাছে এই গুলি সংগ্রহ করার দুটি আলাদা রাস্তা খোলা ছিল। তার একটি হল আমূল ভূমি-সংস্কার ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে কৃষিকে প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কের বন্ধন থেকে মুক্ত করা, এভাবে কৃষি উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুঁজি ও বাজারের সমস্যা সমাধান করা এবং ধাপে ধাপে নিজস্ব প্রযুক্তি বিকশিত করা। এই রাস্তার আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল বিদেশী শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা এবং তার শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করা।

এই রাস্তাটি সাধারণত চীনা পথ বা মাও-সে-তুং এর পথ নামে পরিচিত। কারণ ১৯৪৯ সালে চীনা বিপ্লবেরপর মাও-সে তুং এর নেতৃত্বে চীন এই রাস্তা গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় রাস্তাটি হল কৃষিতে প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা, ভূমি-সংস্কার ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংস্কারে বাধা দেওয়া, অর্ধেকের বেশি মানুষকে দিনে একবেলা খেতে পাওয়ার অবস্থায় রেখে দেওয়া, এবং ফলতঃ পুঁজি, প্রযুক্তি ও এমন কি বাজারের জন্যও সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভর করা। ভারতীয় শাসক-শ্রেণী দ্বিতীয় রাস্তাটিই বেছে নেয়। তারা তেলেঙ্গানা, তেভাগা ও অন্যান্য কৃষক সংগ্রামগুলিকে নির্মমভাবে দমন করে। জমিদারদের সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার ও লুণ্ঠন টিকিয়ে রাখে এবং পশ্চাদপদ জাতি (OBC) সংক্রান্ত কাকা কালেলকার কমিশনের রিপোর্টকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে প্রশাসন সহ সমগ্র সমাজ-জীবনে ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্য টিকিয়ে রাখে। ফলে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোন রাস্তা থাকে না। সাম্রাজ্যবাদী ঋণ ও প্রযুক্তির

সাহায্যেই তখনকার তথাকথিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পগুলি (দুর্গাপুর—বৃটিশ, রাউরকেল্লা—জার্মান, ভিলাই—রাশিয়া, বোকারো—রাশিয়া, এম এ এম সি—রাশিয়া) গড়ে ওঠে। পঞ্চাশ, ষাটের দশকে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করাই ছিল সাম্রাজ্যবাদের রণনীতি।

১৯৪৫ থেকে প্রায় ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময় ছিল বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটানা দ্রুত বিকাশের যুগ। পুঁজিবাদের জীবনে একে স্বর্ণযুগ বলা চলে। সেই যুগে তার অধীনস্থ তৃতীয় দুনিয়াতে কিছু বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু '৭০ এর দশক থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদ সংকটের মধ্যে পড়েছে সে সংকট এখনো চলছে। তার থেকে বেরিয়ে আসার কোন রাস্তাই তাদের পণ্ডিতেরা দেখতে পারছে না। এই অবস্থায় সংকটের বোঝা তৃতীয় দুনিয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার রণনীতি নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ। তাদের নির্দেশে শুরু হয়েছে তথাকথিত কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস (Structure Adjustment) যার মূল কথা হল তৃতীয় দুনিয়ায় আরো বেশি পুঁজি রপ্তানি, এবং আরো সস্তায় এখানকার কাঁচামাল ও শ্রমশক্তি লুণ্ঠন। সুতরাং সরকারী মালিকানাধীন সব শিল্প বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দাও, স্থায়ী শ্রমিক ছাঁটাই করে ব্যাপকভাবে ঠিকাদার শ্রমিক লাগাও, ভারতীয় অবস্থাতেও জীবন-ধারণের জন্য যে ন্যূনতম মজুরি প্রয়োজন তারও অর্ধেক বা আরো কম মজুরি দিয়ে খাটাও এবং মুনাফার অঙ্ক স্ফীত কর। এভাবেই তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে শ্মশানে পরিণত করে সাম্রাজ্যবাদ আজ নিজেকে কোনক্রমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে সকল নীতির ফলে কয়লা শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়েছে তা ছিল সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ এক বিকাশের রাস্তা অনুসরণের ফল। আর আজ সেই সংকট থেকে বেরোনর জন্য দেশের অর্থব্যবস্থাকে আরো বেশি করে সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ করা হচ্ছে। যেমন বীমা ক্ষেত্র ও অন্যান্য আর্থিক ক্ষেত্র বিদেশী পুঁজির কাছে খুলে দেওয়া হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশ মত প্যাটেন্ট আইন তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ রোগের যা কারণ তাকেই ওষুধ বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ও খনি এলাকা সহ সারা দেশের শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক জনগণ কয়লাখনি বন্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। জনগণের মেজাজ দেখে ভারত সরকার ভয় পেয়েছে এবং কৌশলে ধাপে ধাপে তাদের কর্মসূচী রূপায়নের পথ নিয়েছে। কিন্তু জনগণ তাদের কৌশল ধরে ফেলেছে। সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ বিকাশের রাস্তার দেউলিয়াপনাও জনগণ দেখতে পাচ্ছেন। সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও সমস্ত বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করার শ্লোগান ক্রমশঃ বেশি বেশি মানুষ গ্রহণ করেছেন।

---